اشراق

Ishraq USA | Bangla Edition

ইশরাক বাংলা সংস্করণ। সেপ্টেম্বর ২০২৬

আল-ইশরাক

বাংলা

সম্পাদক: মাওলানা উমর ফারুক

সম্পাদনা পরিষদ:

মঞ্জুর এলাহী

হুমায়ুন কবির

মোহাম্মদ সিয়াম হোসেন

ইমদাদ হোসেন

GHAMIDIBANGLA.COM

اشراق

Ishraq USA | Bangla Edition

ইশরাক বাংলা সংস্করণ। সেপ্টেম্বর ২০২৬

আল-ইশরাক

বাংলা

সূচিপত্র

১) সম্পাদকীয় ৩

২) কুরআনের তরজমা : সুরা বাকারা [২৩-২৯] ৬

৩) বই অনুবাদ: কুরআন ব্যাখ্যার ভাষাগত উৎস ৯

৪) প্রবন্ধ: সভ্য দুনিয়ার অসভ্য খেলা ১৭

৫) তাত্ত্বিক পর্যালোচনা: শুরা ব্যবস্থা এবং রাজতন্ত্র ২১

৬) তাত্ত্বিক পর্যালোচনা: ব্যভিচার নিষিদ্ধ হওয়ার মূল দর্শন ৩০

৭) তাত্ত্বিক পর্যালোচনা: “আমার উম্মতের মাঝে খেলাফত থাকবে ত্রিশ বছর”: হাদিসের পর্যালোচনা ৩৪

৮) সাহিত্য: গজল ৪২

Ghamidi Center of Islamic Learning

www.ghamidi.org

AN INITIATIVE OF AL-MAWRID US.

সম্পাদকীয়

আমাদের দায় ও প্রত্যয়

মাওলানা উমর ফারুক

মার্চ ২০২৫-এ ‘আল-ইশরাক বাংলা’র প্রকাশনা শুরু হয়। এক বছরেরও বেশি সময়ের এই পথচলায় আমরা কয়েকটি সংখ্যা পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছি। প্রতিটি সংখ্যা আমাদের জন্য যেমন একটি প্রকাশনার পর্ব, তেমনি নিজেদের উদ্দেশ্য, মানদণ্ড ও দায়িত্বকে নতুন করে পর্যালোচনা করার সুযোগ।

‘আল-ইশরাক বাংলা’ একটি ত্রৈমাসিক চিন্তাপত্র। এর উদ্দেশ্য কোনো প্রচলিত চিন্তাধারার প্রচার নয়; বরং জ্ঞান, যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও সমকালীন বিষয় নিয়ে চিন্তার পরিসর তৈরি করা। আমরা মনে করি, কোনো বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা তার জনপ্রিয়তা, প্রাচীনতা কিংবা নতুনত্বের ভিত্তিতে হওয়া উচিত নয় – বরং তার সত্যতা এবং প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

এই নীতিই আমাদের সম্পাদকীয় অবস্থানের ভিত্তি। আমরা প্রচলিত ধারণাকে শুধু প্রচলিত হওয়ার কারণে গ্রহণ করব না; আবার প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করাকেও কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক কৃতিত্ব মনে করব না। প্রমাণের ভিত্তিতেযা সত্য, তা সত্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং যা ভুল, তা ভুল হিসেবে চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন – তার সঙ্গে আমাদের পূর্বপরিচয় বা আবেগ যাই থাকুক না কেন।

আমরা বিশ্বাস করি, জ্ঞানচর্চার অন্যতম শর্ত হলো প্রশ্ন করার স্বাধীনতা।ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে দায়িত্বশীল প্রশ্ন, যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা ও প্রমাণভিত্তিক মতবিনিময় কোনো সমাজকে দুর্বল করে না; বরং তাকে পরিণত করে। তাই মতভিন্নতাকে আমরা চিন্তার স্বাভাবিক অংশ হিসেবে দেখি।তবে সেই মতভিন্নতা হতে হবে যুক্তিনির্ভর, তথ্যনিষ্ঠ এবং শালীন।

গত এক বছরেরও বেশি সময়ে পাঠকদের আগ্রহ ও পরামর্শ আমাদের কাজকে সমৃদ্ধ করেছে। আমরা তার জন্য কৃতজ্ঞ। একই সঙ্গে আমরা এই বিষয়েও সচেতন যে, একটি চিন্তাপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা এক দিনে অর্জিত হয় না; ধারাবাহিকতা, সততা ও মানের প্রতি দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়েই তা অর্জিত হয়।

'আল-ইশরাক বাংলা' সেই দীর্ঘমেয়াদি পথেই এগোতে চায়।আমরা জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতায় নামতে চাই না; আমাদের লক্ষ্য হলোপ্রয়োজনীয় ও মানসম্পন্ন একটি বাংলা চিন্তাপত্র হিসেবে 'আল-ইশরাক বাংলা'কে প্রতিষ্ঠিত করা।যেখানে পাঠক নিছক কিছু লেখা পড়বেন না – বরং বিষয়কে নতুনভাবে দেখার, প্রশ্ন করার এবং নিজের অবস্থান পুনর্বিবেচনার সুযোগ পাবেন।

নতুন সংখ্যাটি সেই দায়িত্ববোধেরই আরেকটি প্রকাশ।এর প্রতিটি লেখা পাঠককে চিন্তার খোরাক দিক।আমরা চাই পাঠক পড়ুন, যাচাই করুন, প্রশ্ন করুন এবং প্রয়োজন হলে দ্বিমত প্রকাশ করুন।কারণ সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ পাঠকই একটি চিন্তাপত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি।

আমাদের পথ দীর্ঘ। এই পথের সাফল্য নির্ভর করবে ধারাবাহিকতা, মান এবং নীতিগত দৃঢ়তার ওপর।আমরা সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেই এগিয়ে যেতে চাই।

'আল-ইশরাক বাংলা' থাকবে সত্যের অনুসন্ধানে, প্রমাণ ও যুক্তির পক্ষে এবং মুক্ত ও দায়িত্বশীল চিন্তার সাথে।

পাঠকের প্রতি আহ্বান – এই বুদ্ধিবৃত্তিক যাত্রায় আপনিও আমাদের সহযাত্রী হোন।

সম্পাদক
আল-ইশরাক বাংলা

সুরা বাকারা

জাভেদ আহমেদ গামিদি

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِن لَّمْ
تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ
أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن
ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ ۞

(২৩) (এ গ্রন্থের আহ্বান এটাই, এই আহ্বানকে তোমরা গ্রহণ করো)। আর আমি আমার বান্দার উপর যা অবতীর্ণ করেছি, সেটির ব্যাপারে তোমাদের যদি কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে (যাও) এর মতো একটি সূরা বানিয়ে নিয়ে আসো। আর (এ কাজের জন্য) আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যেসকল সাহায্যকারী রয়েছে, তাদেরকেও ডাকো; যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(২৪) যদি তোমরা তা করতে না পারো, আর কখনোই করতে পারবে না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় করো যেটির ইন্ধন হবে এই মানুষগুলো যারা (বিশ্বাস করে না) আর এই পাথরগুলো (যেগুলোকে তারা পূজা করে)।এ আগুনটি প্রস্তুত করা হয়েছে এ সব অস্বীকারকারীর জন্য।

(২৫) আর (হে নবী) যারা (এ গ্রন্থের প্রতি) ঈমান এনেছে এবং সৎ কর্ম করেছে তাদেরকে আপনি এই সুসংবাদ জানিয়ে দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে এমনসব বাগান, যেগুলোর নিচ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত হবে।সেই বাগানগুলোর কোনো একটি ফল যখন তাদেরকে খাওয়ার জন্য দেয়া হবে, তখন তারা বলবে, এটি তো সেই ফল, যা আমাদেরকে ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে; অথচ এটি আগেরটির সাথে মিল রেখে তাদেরকে দেয়া হবে।আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ: সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

(২৬) (এটা জান্নাতের উপমা; এভাবে) আল্লাহ (কোনো সত্যকে প্রকাশ করার জন্য) মশা কিংবা তার চেয়েও তুচ্ছ কোনো কিছুর উপমা দিতে লজ্জাবোধ করেন না।অতএব যারা বিশ্বাসী তারা জানে যে, এটি তাদের প্রভুর তরফ থেকে আসা সত্য।

আর যারা অস্বীকারকারী তারা বলে যে, এ উপমাটি দিয়ে আল্লাহ কী বোঝাতে চাইলেন? (এভাবে) আল্লাহ এর দ্বারা অনেককে বিপথগামী করেন এবং অনেককে এর দ্বারাই পথ দেখান। আর বাস্তবতা হচ্ছে, তিনি শুধু অবাধ্য লোকদেরকেই এর দ্বারা বিপথগামী করেন।

(২৭) যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভেঙে ফেলে, যে বন্ধনটি আল্লাহ জুড়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে ফেলে, আর এভাবে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে।এরাই (দুনিয়া ও আখিরাতে) ব্যর্থ।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

(২৮) (হে মানুষেরা) কীভাবে তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার করো? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন,তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। আবার তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন, এরপর তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করবেন, এরপর তাঁর দিকেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

(২৯) তিনিই তো তোমাদের জন্য পৃথিবীর সকল জিনিস সৃষ্টি করেছেন, এরপর আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং সাপ্ত আকাশ দাঁড় করিয়েছেন।আর তিনি সকল বিষয়ে অবগত।

কুরআন ব্যাখ্যার ভাষাগত উৎস

ইমাম হামিদ উদ্দিন ফারাহি

আল্লাহ কেবল পবিত্র কুরআনকে হারিয়ে যাওয়া বা বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তাই দেননি, বরং তিনি এর ব্যাখ্যা করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

নিঃসন্দেহে আমিই এই উপদেশবাণী (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।(১৫:০৯)

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

তারপর এর ব্যাখ্যা বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়া আমারই দায়িত্ব।(৭৫:১৯)

কুরআন ব্যাখ্যা করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য জরুরি ছিল, কুরআনের ভাষা—আরবিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা। তাই আল্লাহ এই ভাষাকে টিকিয়ে রেখেছেন এবং একে দিয়েছেন চিরন্তন জীবন। একইভাবে, তিনি পবিত্র কুরআনের ধর্মীয় পরিভাষার অর্থকেও সুরক্ষিত রেখেছেন; যেমন—সালাহ, জাকাত, জিহাদ, সাওম, হজ, মসজিদ, হারাম , সাফা ও মারওয়া, এবং হজের আনুষঙ্গিক রীতিনীতি।

এই ধর্মীয় পরিভাষাগুলোর সঠিক অর্থ এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে নিরবচ্ছিন্নভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।যদিও এই আমলগুলো পালনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে সামান্য মতপার্থক্য রয়েছে, তবে তা একেবারেই নগণ্য।উদাহরণস্বরূপ– আরবি 'আসাদ' শব্দের অর্থ সিংহক, যদিও বিভিন্ন অঞ্চলে সিংহের রং বা শারীরিক গড়নে পার্থক্য থাকতে পারে।একইভাবে, আমাদের ওপর যে সালাত ফরজ করা হয়েছে, তা সেই সালাত যা মুসলমানরা আজও আদায় করে আসছেন, যদিও এর পদ্ধতি ও অনুষঙ্গে সামান্য কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যে ব্যক্তি এসব সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করে, তিনি মূলত আল্লাহর দ্বীনের সুদৃঢ় অবস্থান থেকেই বিচ্যুত।আল্লাহ বলেছেন,

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ

আল্লাহর কাছে এগুলোর (কোরবানির পশুর) গোশত বা রক্ত কিছুই পৌঁছায় না;
বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া বা খোদাভীতি।(২২:৩৭)

ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বিতর্ক করা মূলত ইহুদীদের লক্ষণ, তারা নিজেদের ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছিল এবং নানাবিধ সন্দেহের চোরাবালিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাদের এই মানসিকতাকে তুলে একটি গাভী জবাই করার ঐশ্বরিক আদেশের ঘটনায় বর্ণনা রয়েছে। তাদের নবী বারবার তাদের বলছিলেন, তোমাদের যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করো, অথচ তারা একের পর এক প্রশ্ন করেই যাচ্ছিল । এমনকি এত অযৌক্তিক জিজ্ঞাসাবাদের পরও তারা আদেশটি মানতে প্রস্তুত ছিল না। কথোপকথনের এক পর্যায়ে তারা যান্ত্রিকভাবে "ইনশাআল্লাহ" বা "আল্লাহ চাহেন তো" শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিল, কেবল সেই শব্দের বরকতেই শেষ পর্যন্ত তারা তাদের রাসূলের আনুগত্য করতে সক্ষম হয়েছিল।সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণীই এর প্রমাণ; তাদের এই অনমনীয়তা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তারা তা করতে যাচ্ছিল না।শরিয়াহর কিছু পারিভাষিক শব্দ রয়েছে, যার সংজ্ঞা পবিত্র কুরআনে নেই, সেসব ক্ষেত্রে আমাদের অন্ধভাবে হাদিসে ওপর নির্ভর করা উচিত নয়।

এটি আমাদের অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত বিষয়ের ওপরই সন্তুষ্ট থাকা শ্রেয়। যেসব বিষয়ে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট কোনো দলিল নেই অথবা যা রাসূল (সা.)-এর সুপ্রমাণিত ও প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসেনি, সেসব বিষয়ে অন্যদের দোষারোপ করা থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। পরিশেষে বলতে হয়, পবিত্র কুরআনের শরিয়াহর পরিভাষাগুলো নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের উচিত উল্লিখিত সুস্পষ্ট পথ অনুসরণ করা এবং অপ্রয়োজনীয় ছোটখাটো মতপার্থক্য এড়িয়ে কুরআনের মূল মর্মার্থকে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা।

কুরআনের ভাষাশৈলী এবং শব্দাবলির আক্ষরিক ও রূপক অর্থ বোঝার জন্য ধ্রুপদী আরবি কবিতা এবং পবিত্র কুরআনের মূল পাঠই হলো প্রধান ভিত্তি বা উৎসব। এ বিষয়ে আরবি অভিধান খুব একটা সহায়ক নয়; কারণ সেগুলোতে ভাষার সব শব্দ ও শব্দের ব্যবহারের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় না। অভিধানে অনেক বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচনা করা হয় না এবং কোনটি বিশুদ্ধ ধ্রুপদী আরবি আর কোনটি পরবর্তীকালে রূপান্তর হওয়া শব্দ, তা পৃথক করার কোনো উপায় নেই।এমনকি অভিধানগুলো শব্দের মূল উৎস বা শিকড় সম্পর্কেও সঠিক দিকনির্দেশনা দেয় না। যার ফলে শব্দের মূল ভিত্তি ও শাখা অথবা আক্ষরিক ও রূপক অর্থের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। যে শিক্ষার্থীর ধ্রুপদী আরবি কবিতার ওপর পূর্ণ দখল নেই, সেই শিক্ষার্থী যখন এই অভিধানগুলোর শরণাপন্ন হয়, তখন কুরআনের শব্দগুলোর সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য নির্ণয় করতে সে ব্যর্থ হয়। তদুপরি, বর্তমানে প্রচলিত ধ্রুপদী আরবি কবিতার বড় একটা অংশই কৃত্রিম বা পরবর্তীকালে সংযোজিত। অনেক বিলুপ্ত শব্দ এবং দুর্লভ ব্যবহার তাতে অনুপ্রবেশ করেছে। তবে একজন ভাষাবিদ খাঁটি ও ভেজালের পার্থক্য অবশ্যই বুঝতে পারেন।তাই সর্বদা মনে রাখতে হবে, কুরআনের ব্যাখ্যা করার সময় হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তা-ই ব্যবহার করা সমীচীন নয়।

আমাদের কেবল সেগুলোই গ্রহণ করা উচিত যা নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত, আর দুর্লভ বা অস্পষ্ট বিষয়গুলো আমাদের বর্জন করা আবশ্যক। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى الشَّيْطَـٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ

আপনার পূর্বে আমি যে রাসূল বা নবীই প্রেরণ করেছি, তিনি যখনই কিছু কামনা (তামান্না) করেছেন, শয়তান তাঁর কামনায় প্ররোচনা সৃষ্টি করেছে। (২২:৫২)

কিছু মুফাসসির উল্লেখিত আয়াতে 'তামান্না' শব্দটির অর্থ 'তিলাওয়াত' বা পাঠ করা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।একটি জটিল বিষয় ব্যাখ্যা করার দায় এড়াতে গিয়ে মুফাসসিরগণ শব্দটির সুস্পষ্ট ও প্রচলিত অর্থ বর্জন করে এর একটি দুর্লভ ও অপ্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেছেন।তবে এটি কোনো সুফল বয়ে আনেনি; বরং এর বিপরীতটিই ঘটেছে–এটি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিতর্ক, বিভেদ ও মতপার্থক্যের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।যে কেউ এই স্পষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত হবে, সে অজ্ঞতার গোলকধাঁধায় হারিয়ে যেতে বাধ্য। ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, ইসলামি আইনশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র , বালাঘাত ও ছন্দশাস্ত্রের মতো অন্যান্য শাস্ত্রের ওপর রচিত গ্রন্থসমূহ সংখ্যায় অনেক হলেও, পবিত্র কুরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে সেগুলোও খুব একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করে না।আরবি ব্যাকরণের ভূমিকা মূলত সাধারণ কথ্য বা লেখ্য ভাষার ব্যাকরণগত নিয়ম নির্ধারণেই সীমাবদ্ধ। তাই একজন ব্যাখ্যাকার বা মুফাসসিরের উচিত নয় আল্লাহর বাণীকে এই সীমাবদ্ধ ব্যাকরণিক নিয়মের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো, যার ফলে আয়াতের স্পষ্ট অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এর মূল শৈলী উপেক্ষিত হয়। এই ধরনের বিশ্লেষণ পবিত্র কুরআনকে এক অদ্ভুত ধরনের বক্তব্য হিসেবে উপস্থাপন করবে, যা আরবি ভাষার চিরাচরিত সাহিত্যিক রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

একজন মুফাসসিরের দায়িত্ব হলো প্রাসঙ্গিক ধ্রুপদী আরবি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে এটি প্রমাণ করা, যাতে যারা অতি উৎসাহের সাথে আল্লাহর কিতাবে ব্যাকরণগত বা শৈলীগত ভুল খোঁজার চেষ্টা করে, তারা বুঝতে পারে যে, এটি সর্বোচ্চ সাহিত্যিক মানসম্পন্ন একটি গ্রন্থ।

যুক্তিবিদ্যা এটি মূলত যুক্তি ও বিতর্কের কৌশল এবং সংজ্ঞা, নঞর্থক বা ব্যতিক্রমী শব্দ ব্যবহারের ওপর চুলচেরা বিশ্লেষণের করে। যেসব মুফাসসির কুরআনের আয়াত অনুবাদের ক্ষেত্রে এই শাস্ত্রের আশ্রয় নেন, তারা 'وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا অথবা 'وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ –এর মতো গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আয়াতগুলোর সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে পারেন না। তারা কুরআনের নিজস্ব যুক্তিবিন্যাস ও শৈলী বুঝতেও ব্যর্থ হন। অলঙ্কারশাস্ত্রের অবস্থাও ব্যাকরণ শাস্ত্রের মতোই শোচনীয়। যারা এই শাস্ত্রে পারদর্শী, তারা কোনো জীবন্ত হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত আবেগময় বক্তব্যের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ করতে অক্ষম। তাই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ঐশী বাণীর ক্ষেত্রে এই শাস্ত্র সম্পূর্ণ অকার্যকর। নবী-রাসুলগণ তাদের শ্রোতাদের পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের সত্যের দিকে আহবান করতেন। তারা কোথাও রূপক ভাষা ব্যবহার করতেন, আবার কোথাও আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করতেন। তারা প্রচলিত ভাষারীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন এবং শ্রোতাদের মেধা ও বোঝাপড়ার স্তরকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতেন। এ কারণেই আমরা দেখি, একজন নবী 'আব' (পিতা) ও 'ইবন' (পুত্র)-এর মতো শব্দ ব্যবহার করছেন; নিজের দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার কথা বলছেন; এমনকি নিজের রক্ত-মাংস অন্য কারো মধ্যে মিশে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। তিনি 'য়াদ' (হাত), 'সাক' (পায়ের গোছা), 'ওয়াজহ' (চেহারা), 'আরশ' (সিংহাসন), 'কুরসি' (আসন), 'বাস্ত' (প্রসারণ), 'কবজ' (সংকোচন), 'নশর' (বিস্তার), 'তায়্য' (গুটিয়ে নেওয়া), 'হাসরাহ' (আক্ষেপ), 'ইনতিকাম' (প্রতিশোধ), 'গজব' (ক্রোধ) এবং 'হানান' (করুণা)-এর মতো শব্দ ও অভিব্যক্তি ব্যবহার করেছেন। শ্রোতারা বরাবরই এগুলোর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারতেন।

কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে অলঙ্কারশাস্ত্রের গণ্ডিতে আটকে ফেলেন, তিনি ঐশী বাণীর এই পথ চলায় পিঁপড়ার মতো অসহায় হয়ে পড়েন। অন্ধের মতো হোঁচট খান এবং পদে পদে পথভ্রষ্ট হন। যারা যাবুর বা অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত, তারা ভালোভাবেই জানেন যে, এসব গ্রন্থতে রূপক ভাষার ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক।ইসলামি আইনশাস্ত্র বা উসুলুল ফিকহের ক্ষেত্রে এর প্রতিষ্ঠাতা উসুলিগণ (আইনশাস্ত্রের মূলনীতি প্রণেতা) সত্যিই প্রশংসনীয় অবদান রেখেছিলেন। তারা এই শাস্ত্র রোমান, ভারতীয় কিংবা অন্য কোনো জাতির কাছ থেকে ধার করেননি। বরং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ বোঝার জন্য তারা এই জ্ঞানকে অপরিহার্য মনে করেছিলেন। তাই এই উৎসগুলো থেকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আইনগত সিদ্ধান্ত বের করার সুবিধার্থে তাদের কিছু দিকনির্দেশনামূলক মূলনীতি তৈরি করার প্রয়োজন ছিল। নিঃসন্দেহে এ কারণেই তারা এই শাস্ত্রের পথিকৃৎ এবং পরবর্তীকালে অন্যরা তাদেরই অনুসরণ করেছে।

দুর্ভাগ্যবশত, পরবর্তী প্রজন্মের স্কলাররা এই শাস্ত্রটিকে আর উন্নত করতে পারেননি। তারা একে সুবিন্যস্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে এই শাস্ত্রটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে এবং প্রকৃত অর্থে একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তাইএই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাবে মানুষ কুরআনের বিধানগুলো নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, যা মোটেও কাম্য নয়। অবশ্য ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা বা সমগোত্রীয় অন্যান্য শাস্ত্রের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না; কারণ সেগুলোকে যথাযথভাবে ‘শাস্ত্র’ বা ‘ডিসিপ্লিন’ হিসেবে গণ্য করা যায়। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় আমি কেবল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করব, বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া সম্ভব নয়। তবে আমি ইসলামি বিজ্ঞানের এই শাখাটি নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা রাখি; আর এ কাজের জন্য আমি আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি, যাঁর হাতেই সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ। বালাঘাত শাস্ত্র কেবল আরবি কবিতার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

কবিতা কেবল বাক্যের সুন্দর গঠন, শব্দ ও শব্দগুচ্ছের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের কৌশলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটি বর্ণনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিকই যেমন–যুক্তিতর্কের বিভিন্ন ধরন, শব্দের সাথে অভিপ্রেত অর্থের সম্পর্ক, উপমা ও দৃষ্টান্তের ব্যবহার, নীতিকথা সম্বলিত বর্ণনার বিবিধ রীতি, প্রতিশ্রুতি, সতর্কবার্তা এবং বক্তার অটল আত্মবিশ্বাস থেকে উৎসারিত বক্তব্যের প্রভাব ইত্যাদি বাদ দিয়ে যায়।এছাড়া কবিতা আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এড়িয়ে যায়।উদাহরণস্বরূপ, কখনো কখনো একজন আত্মপ্রত্যয়ী বক্তা সচেতনভাবেই শ্রোতার আপত্তিগুলোকে এড়িয়ে যান। আবার কখনো তিনি একজন উদ্বিগ্ন ও শুভাকাঙ্ক্ষী শিক্ষকের মতো আবেগ প্রকাশ করেন। বাকপটু বক্তা এবং ঐশী গ্রন্থগুলোতে ব্যবহৃত এই কৌশলগুলো বর্তমান শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। স্কলাররা প্রকাশভঙ্গির এই বৃহত্তর অংশটিকে উল্লেখ করতে পারেননি, কারণ তারা বিখ্যাত আরব বাগ্মীদের বক্তব্যকে এই শাস্ত্রের আলোচনার বিষয়বস্তু করেননি। এর কারণ হলো, তারা আরবদের বক্তৃতামালা থেকে পর্যাপ্ত উপকরণ পাননি, আর অনারবদের বক্তৃতার বিষয়টিকে তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়িয়ে গেছেন।

এ কারণেই আল্লামা বাকিলানী কুরআনের অলঙ্কার ও প্রাঞ্জলতা অনুধাবনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা সত্ত্বেও প্রমাণ হিসেবে কেবল আরবি কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন। তবে তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে কিছু বিখ্যাত ভাষণ লিপিবদ্ধ করেছেন, যাতেকেউ কবিতা ও গদ্য–এই দুই ধরনের বক্তব্যের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারে। ভাষার যে দিকগুলো এই শাস্ত্রের অধীনে আলোচিত হওয়া উচিত ছিল তিনি তা করেননি, তার সংখ্যা হলো দশটি। এর মধ্যে পাঁচটি বুদ্ধিদীপ্ত বা যুক্তিনির্ভর এবং পাঁচটি আবেগময় বা মনস্তাত্ত্বিক।যেহেতু এগুলো পৃথিবীর সব ভাষারই সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তাই আমি এগুলোর ব্যাখ্যায় আরবি ছাড়া অন্য যেকোনো ভাষার সহায়তা নিতে পারি অথবা কেবল ইঙ্গিত করলেই চলে।পবিত্র কুরআনের ভেতরেই এ ধরনের শৈল্পিক ব্যবহারের পর্যাপ্ত উদাহরণ বিদ্যমান।

সমসাময়িক বালাঘাত বা অলঙ্কারশাস্ত্র পবিত্র কুরআনের প্রকাশভঙ্গি অনুধাবনে খুব একটা সহায়ক নয়। এই শাস্ত্রের বেশিরভাগ পন্ডিত অনারব, যাদের পক্ষে আরবি ভাষার সূক্ষ্ম প্রকাশভঙ্গি অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও আত্মস্থ করা বেশ কঠিন ছিল। তাই তাদের ব্যর্থতা নিয়ে অভিযোগ করাটা ন্যায়সংগত হবে না। বরং আমাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করা উচিত যে, তারা অন্তত এই শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপনে সফল হয়েছেন।তারা কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, আবার কখনো তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। বিষয়টি বোঝানোর জন্য আমি অন্য একটি প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব। এছাড়া ছন্দশাস্ত্রএবং এর ব্যবহার নিয়েও একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধবিস্তারিত আলোচনা করব।

(অনুবাদ: মোহাম্মদ সিয়াম হোসেন)

প্রবন্ধ

সভ্য দুনিয়ার অসভ্য খেলা

ড. ইরফান শেহজাদ

মানুষের সুস্থ বিবেক কখনোই অকারণে সংঘাত মেনে নিতে পারে না। আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করা এক জিনিস, সেটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু কেবল মারামারির খাতিরে মারামারি? মানুষের মন স্বভাবতই তা সইতে পারে না। আর সেই সংঘাত যদি হয় নিছক বিনোদনের জন্য, তবে তার কদর্যতা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। কাউকে আঘাত করা, আঘাত করতে বাধ্য করা কিংবা গ্যালারিতে বসে সেই মারামারির তামাশা দেখা– এসবই আসলে মানবতার চরম অবমাননা। এক ধরনের নিষ্ঠুর বর্বরতা। মানুষের ভেতরকার সুস্থ বিবেক সব সময়ই এর বিরুদ্ধে কথা বলেছে। ঠিক এই কারণেই রোমান গ্ল্যাডিয়েটরদের সেই রক্তক্ষয়ী লড়াই আজ ইতিহাসের পাতায় বিলীন হয়ে গেছে। যুদ্ধবিগ্রহেরও একটা লাগাম টানা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এত এত সভ্যতার পরও সেই আদিম বর্বর যুগের কিছু স্মৃতি আজ যেন ঠিকই টিকে আছে সহিংস খেলার মোড়কে। আশ্চর্যের বিষয় হলো: বর্তমানের তথাকথিত সভ্য মানুষ একে খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার বলে মেনে নিয়েছে। তারা কেবল এই খেলা উপভোগই করছে না, রীতিমতো সাফাইও গাইছে।

শক্তি আর ক্ষিপ্রতার অনেক রকম খেলাই পৃথিবীতে আছে। এসব খেলায় খেলতে গিয়ে আঘাত লাগতেই পারে, তবে কাউকে আঘাত করা এসব খেলার মূল উদ্দেশ্য থাকে না। মূল উদ্দেশ্য থাকে শারীরিক উৎকর্ষ বা দক্ষতা দেখানো। যেমন ধরুন, ফুটবল, জুডো-কারাতে কিংবা কাবাডি। কিন্তু এমন কিছু খেলাও আছে, যার মূল লক্ষ্যই হলো প্রতিপক্ষকে রক্তাক্ত করা। সহিংসতার মধ্য দিয়েই সেখানে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হয়। বক্সিং বা এমএমএ (MMA) ঠিক এমনই কিছু খেলা। এখানে প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে পারলেই point। আর তাকে 'নকআউট' করে মাটিতে ফেলে দিতে পারলেই তো নিশ্চিত জয়। ভাবলে অবাক লাগে, এসব খেলার নিয়মের মারপ্যাঁচে পড়ে একজন খেলোয়াড় যদি আরেকজনের হাতে প্রাণও হারায়, তবে তাকে ইচ্ছাকৃত খুন বা ভুলবশত হত্যা – কোনোটিই ধরা হয় না।

মানুষের অবচেতন মনে নিষ্ঠুরতা আর হিংস্রতার এক ধরনের আদিম প্রবৃত্তি লুকিয়ে থাকে। মনস্তত্ত্বের ভাষায় একে অনেক সময় 'থ্রিল' বা রোমাঞ্চ বলা হয়। কিন্তু সরাসরি এই রক্তারক্তির ভেতর দিয়ে যাওয়ার সাহস সবার থাকে না। তাই মানুষ নিজের ভেতরের এই পাশবিক আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য কখনো পশুপাখিকে, আবার কখনো নিজেরই মতো আরেকজন মানুষকে লড়াইয়ের ময়দানে নামিয়ে দেয়। পশুদের জন্য তৈরি করা হয় এমন এক হিংস্র পরিবেশ, যাতে তারা একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর মানুষের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় অর্থ আর খ্যাতির বিশাল এক প্রলোভন। সেই মোহে অন্ধ হয়ে মানুষ একে অপরকে মারতে বা নিজে মরতেও রাজি হয়ে যায়। এসব খেলায় যারা জেতে, সমাজ তাদের 'হিরো' বা বীরের আসনে বসায়। অঢেল সম্পদ আর খ্যাতি এসে তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। আর যারা ময়দানে প্রাণ হারায়, তাদেরকে এমনভাবে স্মরণ করা হয় যেন তারা মানবজাতির বিনোদনের জন্য নিজেদের জীবনটাই উৎসর্গ করে দিয়েছে!

এখন একটা বড় প্রশ্ন সামনে আসে, এ ধরনের সহিংস খেলার কি আসলেই কোনো নৈতিক বৈধতা আছে? অনেকেই যুক্তি দেন: যেহেতু খেলোয়াড়রা নিজেদের ইচ্ছায় আর কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনেই খেলতে নামে, তাই এটা পুরোপুরি বৈধ। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলেই বোঝা যায়, একটা কাজ যদি মূলগতভাবে অনৈতিক হয়, তবে কেবল 'পারস্পরিক সম্মতি' আর 'নিয়মকানুনের' দোহাই দিয়ে কি তাকে নৈতিক বানিয়ে ফেলা যায়? একে অপরকে প্রহার করা, রক্তাক্ত করা কিংবা ক্ষতি করার মাধ্যমে জয়ী হওয়া কি মৌলিকভাবে অনৈতিক কাজ নয়? যদি তা-ই হয়, তবে মানুষের সম্মতি আর কিছু বানানো নিয়মের চাদরে ঢেকে দিলেই তা বৈধ হয়ে যায় কীভাবে? মানুষের মনস্তত্ত্ব বড় অদ্ভুত। লোভনীয় কোনো প্রলোভন সামনে ঝুলিয়ে দিলে তাকে দিয়ে বৈধ-অবৈধ যেকোনো কাজই অনায়াসে করিয়ে নেওয়া সম্ভব।

আমাদের এই উপমহাদেশের পুরোনো সতীদাহ প্রথার কথাই ধরা যাক। একসময় স্বামীর চিতায় স্ত্রীর পুড়ে মরাকে বিশ্বস্ততা আর চরম সম্মানের প্রতীক মনে করা হতো। নারীরাও 'সতী' হওয়াটাকে খুব গৌরবের চোখে দেখত। এই অমানবিক প্রথা বন্ধ করতে ইংরেজদের রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হয়েছিল। তারা সতী হতে যাওয়া নারীদের নানাভাবে বোঝাত, প্রলোভন দেখাত। তারপরও নারীরা আগুনে ঝাঁপ দেওয়াকেই বেছে নিত। একটু খেয়াল করলেই দেখবেন, এই ভয়াবহ আত্মাহুতির পেছনে কিন্তু সেই নারীদের পূর্ণ সম্মতি ছিল। তারপরও মানুষের সুস্থ বিবেক কি তা মেনে নিয়েছে? আজ কি কেউ সতীদাহ প্রথার পক্ষে কোনো নৈতিক যুক্তি দাঁড় করাতে পারবে? মানুষের নিজের সম্মতি থাকলেও তার আত্মহননকে যদি আমরা কোনোভাবেই সঠিক বলে মেনে নিতে না পারি, তবে জেনেশুনে একে অপরকে রক্তাক্ত করার অনুমতি আমরা কীভাবে দিচ্ছি? এটা কেমন অদ্ভুত যুক্তি যে, 'বেশি মাত্রায়' সংঘাত হলে তা অপরাধ, আর 'অল্প মাত্রায়' সংঘাত হলে তা বৈধ?

এই সহিংস খেলাগুলোর ব্যাপারে আধুনিক মানুষের এমন উদাসীনতার একটি বড় কারণ হলো: এগুলো আমাদের সমাজে খুব স্বাভাবিক একটা প্রথায় পরিণত হয়েছে। মানুষের মনের একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে। কোনো একটি খারাপ জিনিসের সাথে দীর্ঘদিন অভ্যস্ত হয়ে গেলে, সেই মন্দের কুৎসিত রূপ আর চোখে পড়ে না। গা-সওয়া হয়ে যায়। কিন্তু যখনই যুক্তি আর নীতি দিয়ে মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়, তখন ভেতরের ঘুমিয়ে থাকা সুস্থ বিবেক ঠিকই জেগে ওঠে।

এই সহিংস খেলাগুলোকে নিছকই জুলুম ও সীমালঙ্ঘন হিসেবে দেখা উচিত। নৈতিকতার জায়গা থেকে এর তীব্র নিন্দা জানানো এবং আইন করে এগুলো বন্ধ করে দেওয়া প্রয়োজন। আর মুসলমানদের জন্য তো এসব খেলা সম্পূর্ণ অবৈধ।কারণ তাদের মহান প্রতিপালক আল্লাহতায়ালা যেকোনো ধরনের জুলুম ও অবিচার কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। নিজের জীবনকে নিজের হাতে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়াকে তিনি স্পষ্টভাবে বারণ করেছেন।

তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

শুরা ব্যবস্থা এবং রাজতন্ত্র

ড. ইরফান শেহজাদ

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। আর সমাজের নিজস্ব একটা শৃঙ্খলা থাকা বড্ড প্রয়োজন।মানুষে মানুষে মেলামেশা, তাদের সীমানা নির্ধারণ, নিয়মকানুন তৈরি কিংবা নিজেদের ভেতরের বিরোধ মেটানোর জন্য এমন একটা কর্তৃপক্ষের দরকার হয়, যার সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নেবে।হাসিমুখে হোক আর বাধ্য হয়েই হোক, সেই কর্তৃপক্ষের সামনে সবাইকে মাথা নত করতেই হবে। এটা না থাকলে সমাজে নেমে আসবে চরম নৈরাজ্য, যা কোনো সুস্থ মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বস্তুত, সমাজের এই সামষ্টিক শৃঙ্খলার অন্তর্নিহিত অর্থই হলো: বাকি মানুষের ওপর মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই দাবি ওঠে, এই শাসনক্ষমতা যেন সাধারণ মানুষের ইচ্ছা আর নির্বাচনের ভিত্তিতে আসে।মূলত এটাই হলো ‘শুরা ব্যবস্থা’ কিংবা ‘পরামর্শতন্ত্র’ বা আধুনিক গণতন্ত্রের মূল কথা।মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য এই ব্যবস্থাকে পছন্দ করেছেন।কুরআন মাজিদে তিনি বলেছেন:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ.

“আর তাদের যাবতীয় কাজকর্ম নিজেদের ভেতরের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতেই সম্পাদিত হয়।”
(কুরআন, সুরা শুরা, ৪২:৩৮)

কিন্তু এই পারস্পরিক পরামর্শ বা শুরাভিত্তিক ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে ক্ষমতাকে যদি কেবল কোনো একজন ব্যক্তি, একটা পরিবার বা নির্দিষ্ট কোনো দলের হাতে কুক্ষিগত করে রাখা হয়, তবে তা চরম সীমালঙ্ঘন। এর ফলে কেবল যে সাধারণ মানুষের স্বাধীনভাবে নেতা নির্বাচনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, তা নয়; বরং সমাজে আরও যারা যোগ্য মানুষ আছেন, তাদের সামনে এগিয়ে আসার এবং মেধা দেখানোর সব দরজাও চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। শুরু হয় ক্ষমতার এক অন্ধ লড়াই। রাজতন্ত্রের যুগে যুগে ক্ষমতালোভীদের ভেতরে যে অন্তহীন রক্তক্ষয়ী সংঘাত আমরা দেখেছি, তা আসলে এরই করুণ পরিণতি। শাসকদের গদিতে বসানো বা নামানোর কোনো সর্বসম্মত নিয়ম বা সংবিধান ছিল না বলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই হানাহানি চলে আসছিল। অবশেষে পৃথিবীতে সাংবিধানিক সরকারের যুগ এল এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা চমৎকার রাজনৈতিক সমাধান মানুষ খুঁজে পেল।

শাসনব্যবস্থায় এই পরামর্শতন্ত্রের ব্যাপক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও মহান আল্লাহতায়ালা কিন্তু এই ব্যবস্থাকে একেবারে অলঙ্ঘনীয় কোনো ‘শরয়ি বিধান’ বা হুকুমের মর্যাদা দেননি। তাই কেউ যদি এই পরামর্শতন্ত্র মেনে না চলে, তবে সে শরিয়তের কোনো অলঙ্ঘনীয় সীমানা ভেঙেছে বলে ধরা হবে না। একটু খেয়াল করলেই দেখবেন, যেখানে খোদ শরয়ি বিধানের ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি বিবেচনায় কখনো কখনো ছাড় দেওয়া হয়, সেখানে পরামর্শতন্ত্র তো কোনো শরয়ি বিধানই নয়! এটি বরং একধরনের ব্যবহারিক প্রজ্ঞা বা কর্মকৌশল। কাজেই পরিস্থিতির চাপে পড়ে যদি শাসনের অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতেই হয়, তবে হুট করে কারো ওপর কুফর বা পথভ্রষ্টতার ফতোয়া ছুড়ে দেওয়া যাবে না।

এমনকি নিজের জান-মাল কুরবানি করে এই ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠারও কোনো ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নেই। বনি ইসরাইলের ইতিহাস পড়লেই আমরা দেখতে পাই, আল্লাহতায়ালা স্বয়ং তাদের জন্য রাজতন্ত্রকেই পছন্দ করেছিলেন। কারণ তাদের তখনকার পরিস্থিতি এমন ছিল। বনি ইসরাইলের ভেতরের গোত্রীয় কোন্দল এতটাই চরমে ছিল যে, তারা কোনো ঐক্যবদ্ধ নেতার অধীনে জড়ো হতে পারছিল না। এমনকি আল্লাহতায়ালা যখন তাদের জন্য তালুতকে মনোনীত করলেন, তারা তা নিয়েও আপত্তি তুলল! আল্লাহর মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের ভেতরে একটা সামষ্টিক ঐক্য ধরে রাখা, যা সেই মুহূর্তে পরামর্শতন্ত্র দিয়ে কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। এ কারণেই নবী-রাসুলদের উপস্থিতিতেও তাদের মধ্যে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র চালু ছিল।

মোদ্দাকথা হলো: যদি কখনো পরামর্শতন্ত্র আর রাজতন্ত্রের মাঝে কোনো একটাকে বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে, তবে জ্ঞান আর সুস্থ বিবেকের দাবি হলো পরামর্শতন্ত্রকে বেছে নেওয়া। কিন্তু পরিস্থিতি যদি এমন দাঁড়ায় যে, একদিকে রাজতন্ত্র আর অন্যদিকে চরম নৈরাজ্য, তখন সমাজকে বাঁচাতে রাজতন্ত্রকে বেছে নেওয়াই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আধুনিক যুগেও তো আমরা দেখি, রাষ্ট্র চরম বিপদে পড়লে জরুরি অবস্থা জারি করে সাময়িকভাবে গণতান্ত্রিক অনেক অধিকার স্থগিত করা হয়।

একটা সরকার নির্বাচিত হোক বা অনির্বাচিত, তারা যদি সাধারণ মানুষের ওপর জুলুম আর অবিচার শুরু করে, তবে তার প্রতিবাদ অবশ্যই করতে হবে; তবে তা হতে হবে মৌখিক।ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবাদ করার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র এটিই। আর জালিম শাসকের সামনে এই সত্য কথা সাহসের সাথে মুখের ওপর বলে দেওয়াই সবচেয়ে বড় জিহাদ। এই সত্য বলতে গিয়ে যদি কারো প্রাণ চলে যায়, তবে তাকেই শ্রেষ্ঠ শাহাদাত বলা হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিতে এর চেয়ে বড় কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়নি। কোনো জালিম সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করা বা গায়ের জোরে তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাকে ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছে।

কারণ, এতে সমাজের সামগ্রিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে, দেশে চরম অরাজকতা আর রক্তপাত শুরু হয় (যাকে কুরআনের ভাষায় 'ফাসাদ ফিল আরদ' বলা হয়)। তবে হ্যাঁ, সরকার যদি কোনো অন্যায় বা অনৈতিক কাজের নির্দেশ দেয়, তবে কোনোভাবেই তাদের সেই নির্দেশ মানা যাবে না। একজন সাধারণ নাগরিকের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার ঠিক এই পর্যন্তই।

এখন সরকারের জুলুম যদি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, দেশে টিকে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে ইসলাম নির্দেশ দেয় হিজরত করে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার। আর যদি সেই সুযোগটুকুও না থাকে, তবে হাবিলের সেই বিখ্যাত আদর্শকে মেনে চলতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ নিজের জীবন দিয়ে দেব, তবুও অন্যের রক্ত ঝরাব না– এটাই তখন সবচেয়ে উত্তম আমল। এ বিষয়ে আল্লাহর রাসুল বেশ কিছু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলে গেছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه»، قال: فقال رجل: يارسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينج إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت»، قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، قال: «يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار». (مسلم، رقم ٧٢٥٠)

আল্লাহর রাসুল বললেন: “খুব শিগগিরই অনেক ফিতনা দেখা দেবে। শোনো! এরপর আরও ফিতনা আসবে। সেসব ফিতনার সময় যে চুপচাপ বসে থাকবে, সে ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে, যে হেঁটে যাচ্ছে। আর যে হেঁটে যাচ্ছে, সে ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে, যে ছুটে যাচ্ছে। মনে রেখো! যখন এসব ফিতনা শুরু হবে, তখন যার উট আছে, সে যেন তার উটের কাছে চলে যায়; যার ছাগল আছে, সে যেন ছাগলের পালে চলে যায়, আর যার চাষাবাদের জমি আছে, সে যেন তার জমিতে চলে যায়।” হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসুল! যার উট, ছাগল বা জমি– কিছুই নেই, তার কী হবে?” উত্তরে আল্লাহর রাসুল বললেন, “সে যেন তার তলোয়ারটা নিয়ে পাথরের ওপর ঘষে এর ধার একেবারে ভোঁতা করে ফেলে! এরপর যদি সম্ভব হয়, তবে সে যেন নিজেকে বাঁচিয়ে নেয়।” এরপর তিনি বললেন, “হে আল্লাহ! আমি কি (সত্য) পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি (সত্য) পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?” এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসুল! যদি আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে কোনো এক পক্ষে বা দলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, আর সেখানে কেউ যদি আমাকে তলোয়ার বা তীর দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলে, তখন কী হবে?” উত্তরে আল্লাহর রাসুল বললেন, “(তুমি যদি পাল্টা আঘাত না করে থাকো) তাহলে সেই হত্যাকারী তার নিজের পাপ এবং তোমার পাপ– সবকিছু নিজের কাঁধে নিয়ে ফিরবে, আর সে জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”

(সহিহ মুসলিম, রেওয়ায়েত নম্বর: ৭২৫০)

ধরে নিন, কোনো মুসলিম সরকার সরাসরি মানুষের ওপর জুলুম করছে না, নিজেদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলাও করছে না, কিংবা প্রকাশ্যে কোনো ধর্মদ্রোহিতা বা কুফরিতে লিপ্ত হয়নি। এমন অবস্থায় নিছক সমাজ সংস্কারের দোহাই দিয়ে কিংবা সমাজকে এক ‘আদর্শ রূপে’ ফিরিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে নিজ উদ্যোগে অস্ত্র তুলে নেওয়া কোনো ব্যক্তি বা দলের জন্যই বৈধ নয়।

এতে সমাজের স্বাভাবিক শান্তি ও স্থিতিশীলতাই কেবল নষ্ট হয়। এমনকি যদি তাদের পেছনে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নিরঙ্কুশ সমর্থনও থাকে, তবুও তা জায়েজ হবে না। কারণ ধর্মের দৃষ্টিতে এটি কোনো আবশ্যকীয় কর্তব্য নয়। আল্লাহতায়ালা কখনোই মানুষের কাছে এমন কোনো দাবি করেননি, যার জন্য অকারণে নিজেদের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলতে হবে। বরং জোর করে এমনটা করতে যাওয়া হবে পৃথিবীতে মহাবিপর্যয় বা 'ফাসাদ ফিল আরদ' সৃষ্টির মতো এক ভয়ংকর পাপে লিপ্ত হওয়া। কাজটা যত নেক বা সৎ উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন, এর ফলাফল সেই পাপই।

কেউ যদি সত্যিই সমাজ সংস্কার করতে চান, কিন্তু সাধারণ মানুষের সমর্থন না পান, তবে তার কোনোভাবেই নিজেকে 'স্বঘোষিত ঐশী সেনাপতি' ভাবার কোনো কারণ নেই। শাসনব্যবস্থার সংস্কার করতে চাইলে কিংবা একে কোনো আদর্শ রূপে সাজাতে চাইলে একটিই পথ খোলা আছে: শান্তিপূর্ণভাবে শিক্ষা ও প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করা এবং জনমত গড়ে তোলা। এর বাইরে আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ আসলে ধর্মে নেই।

সত্যি বলতে কী, শাসকদের কাছ থেকে সব সময় একেবারে নিখুঁত বা আদর্শ আচরণ আশা করাটা বোকামি। মানুষের হাতে যখন বিপুল ক্ষমতা আসে, তখন একটু-আধটু সীমালঙ্ঘন হওয়াটা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমন তো কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যায় না যে, জোর করে ক্ষমতা দখল করা নতুন মানুষটি বা রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকবে! কিংবা তার পরের উত্তরসূরিরা সবাই একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা হবেন, যারা কোনো ভুলই করবেন না! যখন এই সুধারণার পেছনে কোনো নিশ্চয়তাই নেই, তখন পেছন থেকে ষড়যন্ত্র করে কিংবা গায়ের জোরে সরকার পরিবর্তনের আসলে কোনো যৌক্তিক ভিত্তিই আর অবশিষ্ট থাকে না।

রাজনৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে মুসলমানদের আসলে কী করা উচিত, সে ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল খুব চমৎকার কিছু নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية». (بخارى، رقم ٧٠٥٤)

আল্লাহর রাসুল বলেছেন: “কেউ যদি তার শাসকের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তবে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কারণ, যে ব্যক্তি জামাত থেকে এক বিঘত পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হলো এবং সেই অবস্থায় মারা গেল, সে মূলত জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।”

(সহিহ বুখারি, রেওয়ায়েত নম্বর: ৭০৫৪)

বিখ্যাত সাহাবি উবাদা ইবনে সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর একটি সুন্দর ঘটনা আছে।

عن جنادة بن أبي أمية، قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله، بحديث ينفع الله به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان». (مسلم، رقم ٤٤٧١)

হযরত জুনাদা ইবনে আবু উমাইয়া বর্ণনা করেন, উবাদা ইবনে সামিত (রা.) যখন অসুস্থ ছিলেন, তখন আমরা তাঁর কাছে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমরা বললাম, “আমাদের এমন একটি হাদিস শোনান, যা আপনি আল্লাহর রাসুল থেকে শুনেছেন এবং যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের উপকার করবেন।”

তখন তিনি বললেন, “আল্লাহর রাসুল আমাদের ডাকলেন এবং আমরা তার হাতে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ নিলাম। তিনি আমাদের কাছ থেকে যেসব বিষয়ের ওপর শপথ নিয়েছিলেন, তা হলো: আমরা আনন্দে ও বিষাদে, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের ওপর অন্য কাউকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও আনুগত্য করব। আর আমরা ক্ষমতার অধিকারিদের সাথে ক্ষমতা নিয়ে সংঘাতে জড়াব না।” আল্লাহর রাসুল আরও বলেছিলেন, “তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা প্রকাশ্য কুফর দেখতে পাও এবং সে ব্যাপারে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকে, (তাহলে এমন পরিস্থিতিতে পাপের কাজে শাসকদের আনুগত্য করা যাবে না)।”

(সহিহ মুসলিম, রেওয়ায়েত নম্বর: ৪৪৭১)

তবে মনে রাখতে হবে, এই সুস্পষ্ট কুফরি দেখার ওপর ভিত্তি করেও কিন্তু সরাসরি অস্ত্র তুলে নেওয়ার কোনো অনুমতি বা নির্দেশ দেওয়া হয়নি। অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কেবল তাদের অন্যায় আনুগত্য থেকে বিরত থাকার কথাই বলা হয়েছে।

অনেকে অবশ্য ভিন্ন একটা যুক্তি দাঁড় করান। তারা একটা সুপরিচিত হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: যেকোনো অন্যায় বা মন্দকে তো হাত দিয়ে প্রতিহত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সরকারের কোনো পাপাচার ঠেকাতে তো অস্ত্র হাতে নেওয়াই যেতে পারে!

তারা মূলত আবু সাঈদ খুদরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত সেই হাদিসের কথা বলেন, যেখানে নবী বলেছেন,

فقال ابو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». (مسلم، رقم ١١٧)

হযরত আবু সাইদ বলেন, আমি আল্লাহর রাসুলকে বলতে শুনেছি, "তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় বা গর্হিত কাজ হতে দেখে, তবে সে যেন নিজ হাত (বা শক্তি) দিয়ে তা বদলে দেয়। যদি তার সেই সামর্থ্য না থাকে, তবে সে যেন মুখে এর প্রতিবাদ করে। আর যদি সেটিরও সামর্থ্য না থাকে, তবে সে যেন অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করে; আর এটিই হলো ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর।"

(সহিহ মুসলিম, রেওয়ায়েত নম্বর: ১১৭)

একটু গভীরভাবে ভাবলেই বোঝা যায়, এখানে অন্যায়কে হাত দিয়ে প্রতিহত করার বিষয়টা কিন্তু মানুষের নিজস্ব সামর্থ্য আর এখতিয়ারের সাথে শর্তযুক্ত। অর্থাৎ আপনার যতটুকু ক্ষমতা বা এখতিয়ার আছে, ঠিক ততটুকুর ভেতরে থেকেই আপনাকে মন্দ কাজ প্রতিহত করতে বলা হয়েছে। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি তা না করে, কেবল তখনই তার ঈমান দুর্বল বলে গণ্য হবে। নিজের সক্ষমতা বা এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে কোনো কাজের জন্য মানুষকে কখনোই ইসলাম বাধ্য বা দায়বদ্ধ করেনি।

তাই কোনো দল বা গোষ্ঠী যদি 'সংস্কারের' বিশাল এজেন্ডা নিয়ে সরকার হটিয়ে দেওয়ার জন্য রাস্তায় নামে, তবে তা সমাজকে ঠিক করবে না, উল্টো দেশজুড়ে এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ আর বিশৃঙ্খলা ডেকে আনবে। ঠিক এই কারণেই রাসুল তার ইন্তেকালের পর রাজনৈতিক পালাবদলের নামে সমাজে ফিতনা সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করে গেছেন। তিনি মুসলমানদের এই নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, তারা যেন কোনো অবস্থাতেই আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো গোষ্ঠীর সাথে মিশে গিয়ে নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে না নেয়।

তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

ব্যভিচার নিষিদ্ধ হওয়ার মূল দর্শন

ড. ইরফান শেহজাদ

মানুষের জীবনে ব্যভিচার বা অবাধ যৌনাচার কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে? এর সবচেয়ে বড় কারণ লুকিয়ে আছে আমাদের ‘পরিবার’ নামের চমৎকার ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে। মানুষ হিসেবে পরিবার ছাড়া আমাদের এক মুহূর্তও চলে না। একটু ভেবে দেখুন তো, একদম অসহায় একটি নবজাতক শিশুর বেড়ে ওঠা, কিংবা জীবনের শেষ বেলায় বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মানুষটির সেবাযত্ন– এগুলো কি পরিবারের সেই মায়াময় বন্ধন আর আপনজনদের গভীর মনোযোগ ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব? নারী ও পুরুষের মধ্যকার যে শারীরিক সম্পর্ক, সেটিকে মূলত মানব প্রজন্মের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা আর চমৎকার একটি পরিবার গড়ে তোলার মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়েছে।

আর ঠিক এই পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই একটি অলঙ্ঘনীয় নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে: এই সম্পর্কটুকু কেবল স্বামী আর স্ত্রীর একান্ত গণ্ডির ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এখন কারো মনোযোগ বা যৌন আকাঙ্ক্ষা যদি নিজের ঘরের সীমানা পেরিয়ে বাইরেও বিচরণ করতে শুরু করে, তবে কি সেই মানুষের পক্ষে নিজের সন্তানদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য ঠিকমতো সময় আর ভালোবাসা দেওয়া সম্ভব হবে?

মোটেও না। আর পারিবারিক ব্যবস্থাই যদি ভেঙে পড়ে, তবে মানুষ এই বিশাল পৃথিবীতে বড্ড একা, সহায়সম্বলহীন আর বন্ধুহীন হয়ে পড়বে। ঠিক এই প্রয়োজনগুলোর কথা মাথায় রেখেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার গভীর বিশ্বস্ততাকে বিয়ের সম্পর্কের সবচেয়ে জরুরি মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়েছে। এমনকি যেকোনো ধরনের অবাধ যৌনাচারকে 'ফাহিশা' বা চরম অপবিত্র কাজ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। মানুষের এই পাশবিক প্রবৃত্তিকে একটি সুন্দর শৃঙ্খলার ভেতরে আনার জন্যই বিয়ের আগে যেকোনো শারীরিক সম্পর্ককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে; একে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবেও সাব্যস্ত করা হয়েছে। কারণ বিয়ের আগের এই উচ্ছৃঙ্খলতা বিয়ের পরে তার জীবনসঙ্গী এবং অনাগত সন্তানদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অবাধ যৌনাচার আসলে সবচেয়ে বেশি কেড়ে নেয় নিষ্পাপ শিশুদের অধিকার। যে শিশু হয়তো বাবা-মায়ের বৈধ বিয়ের মাধ্যমেই পৃথিবীতে এসেছে, কিন্তু বাবা অথবা মা– যেকোনো একজনের বাইরের অনৈতিক সম্পর্কের কারণে সে তার প্রাপ্য মনোযোগ আর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে যে শিশুটি জন্ম নিয়েছে কোনো অবৈধ সম্পর্কের হাত ধরে, সে-ও তো বাবা-মায়ের একটা স্থায়ী ছায়া আর দায়িত্ববোধ থেকে চিরতরে বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ তার বাবা-মায়ের ভেতরে তো সারা জীবন একসাথে পথ চলার কোনো অঙ্গীকারই ছিল না, বিয়ের কোনো চুক্তিও হয়নি।

আসলে সারা জীবন একসাথে পথ চলার একটা দৃঢ় সংকল্প ছাড়া কোনো বিয়েই প্রকৃত অর্থে বিয়ে হতে পারে না। কারণ যে বিয়েতে স্থায়িত্বের কোনো নিশ্চয়তা নেই, সেখানে অনাগত সন্তানের যৌথ লালনপালনেরও কোনো গ্যারান্টি থাকে না। ইসলামে 'নিকাহে মুতআ' বা সাময়িক বিয়েকে নিষিদ্ধ করার পেছনের মূল রহস্যও কিন্তু এখানেই।

এই বিষয়কে আল্লাহতায়ালা কুরআন মাজিদে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন:

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ. (النساء ۴: ۲۴)

“আর এদের বাইরে অন্য যে নারীরা রয়েছে, (তাদের মোহরানা আদায় করে) নিজেদের সম্পদের মাধ্যমে তাদের গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল। তবে শর্ত হলো, তোমাদের সতীত্ব রক্ষাকারী হতে হবে, ব্যভিচারকারী নয়।”

(কুরআন, সুরা নিসা, ৪:২৪)

আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে:

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ. (النساء ۴: ۲۵)

“অতএব, তোমরা এই (দাসীদের) মালিকদের অনুমতিক্রমে তাদের বিয়ে করো এবং প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাদের মোহরানা পরিশোধ করো। তবে শর্ত হলো, তাদের সতী-সাধ্বী হতে হবে; তারা যেন ব্যভিচারিণী কিংবা গোপনে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত না হয়।”

(কুরআন, সুরা নিসা, ৪:২৫)

কুরআনে ‘ইহসান’ বলে চমৎকার একটি আরবি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হলো: পরম যত্নে কাউকে নিজের আশ্রয়ে নেওয়া কিংবা কারো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসা। বিয়ের মাধ্যমে মূলত একজন আরেকজনের আজীবন দায়িত্ব নেন, একটা সুন্দর আশ্রয়ের ছায়াতলে আসেন। এর ঠিক উল্টো শব্দটি হলো ‘মুসাফাহাত’, যার মানে হলো স্রেফ ভোগবিলাস আর ব্যভিচার। জিনা (ব্যভিচার) হোক কিংবা মুতআ (সাময়িক বিয়ে)– দুটি কাজেরই মূল উদ্দেশ্য থাকে স্রেফ ভোগবিলাস। সেখানে সারা জীবনের জন্য দায়িত্ব নেওয়ার কোনো অঙ্গীকার বা মায়া থাকে না। ঠিক এ কারণেই এগুলো সম্পূর্ণ হারাম; আর এর বিপরীতে বিয়ে হলো চরম পবিত্র, দায়িত্বশীল আর মর্যাদাপূর্ণ একটা চুক্তি।

এখন কেউ যদি এমন যুক্তি দেন: “আমরা তো সন্তান নিচ্ছি না, তাহলে সাময়িক বিয়ে বা বিয়ের বাইরের সম্পর্কে ক্ষতি কী?”– এই যুক্তিতেও আসলে অবৈধ সম্পর্ক বৈধ হয়ে যায় না। কারণ নারী-পুরুষকে জীবনের কোনো না কোনো এক ধাপে এসে একটা স্থায়ী ঠিকানার খোঁজ করতে হয়, ঘর বাঁধতে হয়। তখন কিন্তু পরিবারের সেই নিরাপত্তা আর বিশ্বস্ততার প্রশ্নটি ঠিকই আবার সামনে এসে দাঁড়ায়।

এমনকি যারা সত্যি সত্যিই জীবনে কখনো সন্তান চান না, তাদেরকেও অবাধ যৌনাচারের অনুমতি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। প্রথম কথা হলো: এমন মানুষেরা সমাজের খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ বা ব্যতিক্রম। আর পৃথিবীর কোনো আইনি কাঠামোই গুটিকয়েক ব্যতিক্রমের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয় না। আইন সবার জন্য সমানভাবেই প্রযোজ্য। দ্বিতীয়ত, মানুষের মন তো! আজ যে মানুষ সন্তান চাইছে না, এমন তো কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, ভবিষ্যতে তার মনের এই শূন্যতা জেগে উঠবে না, সে একটি সাজানো সংসারের স্বপ্ন দেখবে না।

“আমার উম্মতের মাঝে খেলাফত থাকবে ত্রিশ বছর”: হাদিসের পর্যালোচনা

ড. ইরফান শেহজাদ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَفِينَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ" ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ: أَمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَخِلَافَةَ عُمَرَ، وَخِلَافَةَ عُثْمَانَ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَمْسِكْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ قَالَ: فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً، قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ؟ قَالَ: كَذَبُوا بَنُو الزَّرْقَاءِ بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ الْمُلُوكِ.

আহমদ ইবনে মানি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: সুরাইজ ইবনে নুমান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: হাশরাজ ইবনে নুবাতা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন সাইদ ইবনে জুমহান থেকে, তিনি বলেন: সাফিনা (রা.) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “আমার উম্মতের মাঝে খেলাফত থাকবে ত্রিশ বছর, এরপর শুরু হবে রাজতন্ত্র।”

এরপর সাফিনা আমাকে বললেন, “আবু বকরের খেলাফত, উমরের খেলাফত এবং উসমানের খেলাফত গণনা করো।” তারপর তিনি আমাকে বললেন, “আলির খেলাফতও গণনা করো।” সাইদ বলেন, আমরা তা গণনা করে দেখলাম যে, এর মেয়াদ ত্রিশ বছর। সাইদ বলেন, আমি তাকে (সাফিনাকে) বললাম, “বনু উমাইয়ারা তো দাবি করে যে, খেলাফত এখন তাদের হাতে?” সাফিনা বললেন, “বনু যারকা মিথ্যা বলেছে, বরং তারা হলো নিকৃষ্টতম রাজা।” [১]

বিশাল হাদিস ভাণ্ডারে একটু গভীরভাবে খুঁজলে দেখা যায়, পুরো বর্ণনাটি কেবল একজন মাত্র বর্ণনাকারীর ওপর নির্ভরশীল। আর তিনি হলেন সাফিনা, যিনি দাবি করেন যে, তিনি সরাসরি আল্লাহর রাসুল থেকে এটি শুনেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো: এই ব্যক্তি সম্পর্কে ইতিহাসে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। এমনকি সাইদ ইবনে জুমহান যখন তার আসল নাম জানতে চেয়েছিলেন, তিনি তা বলতেও পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানান (তারিখে দামেস্ক, ইবনে আসাকির, ৪:২৬৭)। বর্ণনাকারীদের ইতিহাস নিয়ে যারা গবেষণা করেন অর্থাৎ রিজাল শাস্ত্রবিদগণ তার বেশ কয়েকটি নাম দাঁড় করিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু কেউই শতভাগ নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারেননি।[২]

সাফিনা নিজেই নিজেকে সাহাবি বলে দাবি করতেন। তিনি নিজের পরিচয় দিতেন আল্লাহর রাসুলের খাদেম এবং ‘মাওলায়ে রাসুল’ (অর্থাৎ রাসুলের আজাদ করা দাস) হিসেবে। তার নিজের ভাষ্যমতে, হযরত উম্মে সালামা (রা.) তাকে এই শর্তে কিনে মুক্ত করে দিয়েছিলেন যে, তিনি আজীবন আল্লাহর রাসুলের খেদমত করবেন। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো: সিরাত বা হাদিসের এত বিশাল ভাণ্ডারে অন্য কোথাও তার বা তার এই খেদমতের কোনো উল্লেখ নেই! কেবল তার নিজের মুখেই এই গল্প শোনা যায়। অন্য কোনো সাহাবি কখনো তার সাহচর্য বা তার বর্ণিত ঘটনাগুলোর সত্যতা নিয়ে একটি কথাও বলেননি।

নিজের সম্পর্কে তিনি যেসব ঘটনা বলে বেড়াতেন, তার পরতে পরতে যেন রূপকথার অলৌকিকতার ছোঁয়া। তিনি বলতেন, তার এই 'সাফিনা' (কিস্তি বা জাহাজ) নামটা নাকি স্বয়ং আল্লাহর রাসুল রেখেছিলেন! ঘটনা ছিল এমন: একবার আল্লাহর রাসুল ও তার সাহাবিরা কোনো এক সফরে বেরিয়েছিলেন। পথে সবার মালপত্র বয়ে নেওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল। তখন সবার জিনিসপত্র একটা বড় কাপড়ে বেঁধে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হলো। সেই দৃশ্য দেখে আল্লাহর রাসুল নাকি তাকে 'সাফিনা' উপাধি দিয়েছিলেন। সাফিনা গল্পচ্ছলে এমনও বলতেন, "সেদিন যদি সাতটা উটের বোঝাও আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হতো, আমি তাও অনায়াসে বয়ে নিতে পারতাম!" [৩]

তার গল্পের ঝুলি এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও বর্ণনা করতেন যে, একবার এক সমুদ্রযাত্রায় তাদের নৌকা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তিনি অথৈ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। এমন সময় ভাগ্যক্রমে একটা কাঠের তক্তা তার হাতে চলে আসে। কোনোমতে সেই তক্তায় ভেসে ভেসে তিনি তীরে এসে পৌঁছান। কিন্তু তীরে উঠতেই এক বিশাল সিংহের সাথে তার মুখোমুখি দেখা! তিনি সিংহকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, "হে আবুল হারিস (সিংহের উপাধি), আমি কিন্তু আল্লাহর রাসুলের মুক্ত করা দাস!" এ কথা শোনামাত্রই সিংহটি যেন পোষমানা প্রাণির মতো বাধ্য হয়ে গেল। সে নিজে পথ দেখিয়ে সাফিনাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিল, আর তারপর নিজের মতো করে বিদায় জানিয়ে চলে গেল! [৪]

রূপকথার গল্পে সাধারণত যেসব অতিপ্রাকৃত ব্যাপারস্যাপার থাকে, তার বলা এই ঘটনাগুলোতেও ঠিক সেই বৈশিষ্ট্যগুলোই ফুটে ওঠে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো: তিনি এসব গল্পের কোনো সাল, তারিখ বা জায়গার নাম কিছুই নির্দিষ্ট করে বলেননি। ফলে এগুলোর সত্যতা যাচাই করার কোনো উপায়ই আর থাকে না। যেমন ধরুন, আল্লাহর রাসুলের সাথে ঠিক কোন সফরে গিয়ে তিনি ওই 'সাফিনা' উপাধি পেয়েছিলেন? কিংবা সেই সমুদ্র বা উপকূলটাই বা কোথায় ছিল, যেখানে ওই ভয়ংকর ঝড় আর সিংহের ঘটনাটি ঘটেছিল? এর কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর ইতিহাসে নেই।[৫]

দ্বিতীয়ত, খেলাফত নিয়ে বলা এই হাদিসটি তিনি আল্লাহর রাসুল থেকে ‘মারফু’ হিসেবে (অর্থাৎ সরাসরি রাসুলের নিজ মুখের বাণী হিসেবে) বর্ণনা করেননি।সহজ কথায়, তিনি একবারও দাবি করেননি যে, কথাগুলো তিনি নিজ কানে আল্লাহর রাসুলের কাছ থেকে শুনেছেন।ফলে একটা বড় ধোঁয়াশা থেকেই যায়: কথাগুলো কি তিনি নিজে শুনেছিলেন, নাকি অন্য কারো কাছ থেকে শুনে এখানে বর্ণনা করেছেন?

তৃতীয়ত, এই হাদিসের মূল বিষয়বস্তু পুরোপুরি রাজনৈতিক।আর রাজনীতি তো এমন এক জিনিস, যা নিয়ে সবারই কমবেশি প্রবল আগ্রহ থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো: এই হাদিসটির কথা সাফিনা ছাড়া আর কোনো সাহাবিরই জানা ছিল না! এমনকি যখন সাহাবিদের মাঝে চরম ফিতনা বা রাজনৈতিক মতবিরোধ (মুশাজারাত) চলছিল, তখনো কোনো খলিফা বা সাহাবি নিজেদের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে এই হাদিসটি একবারের জন্যও উচ্চারণ করেননি। এটা কি এমন কোনো গোপন বিষয় ছিল, যা কেবল সাফিনা ছাড়া আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না?

চতুর্থত, যেহেতু এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী, তাই এর সত্যতা প্রমাণের জন্যই ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার আগে এর প্রচার হওয়া খুব দরকার ছিল; যেন মানুষ সতর্ক হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল: চারজন খলিফার যুগ যখন পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল, ঠিক তখনই এই হাদিসটি প্রথমবারের মতো সবার সামনে এল! প্রশ্ন জাগে: সাহাবিদের নিজেদের মধ্যকার সেই রক্তক্ষয়ী বিবাদ বা ফিতনার সময় সাফিনা কেন এই হাদিসের কথা কাউকে বললেন না? কেন তিনি এত দিন এত বড় একটা কথা বুকে চেপে রাখলেন? এই একটি বিষয়ই হাদিসের সত্যতাকে পুরোপুরি সন্দেহের মুখে ফেলে দেয়।

পঞ্চমত, একটু অঙ্কের হিসাব মেলানো যাক। আল্লাহর রাসুল ইন্তেকাল করেন ১১ হিজরিতে। এর সাথে ত্রিশ বছর যোগ করলে খেলাফতে রাশেদার মেয়াদ ৪১ হিজরি পর্যন্ত হওয়ার কথা। অথচ হযরত আলি (রা.) শাহাদাত বরণ করেছেন ৪০ হিজরিতে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে: সাফিনা বছর গণনার যে হিসাবটা দিয়েছেন, সেটাও আসলে ঠিকমতো মেলে না। তা ছাড়া এটি যেহেতু সম্পূর্ণ একক বা মুনফারিদ একটি বর্ণনা, তাই অন্য কোনো বর্ণনার সাথে মিলিয়ে যে, এর সত্যতা যাচাই করা হবে, সেই উপায়টুকুও নেই।

হাদিস বিশারদ বা মুহাদ্দিসগণ আল্লাহর রাসুলের কথা বলার নিজস্ব একটি ভঙ্গি বা বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে চমৎকার একটি মূলনীতি ঠিক করেছেন। তা হলো: ভবিষ্যতের কোনো ঘটনা নিয়ে বলা যেসব হাদিসে সুনির্দিষ্ট বছর বা সময়ের উল্লেখ থাকে, সেগুলো সাধারণত 'মাওজু' বা জাল। কারণ আল্লাহর রাসুল কখনোই ভবিষ্যতের কোনো ঘটনা নিয়ে দিন-তারিখ বা সময় একেবারে নির্দিষ্ট করে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন না। এভাবে সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়ার প্রবণতা আসলে পরবর্তী যুগের হাদিস জালকারিদের একটা চতুর কৌশল। অন্যদিকে আল্লাহর রাসুল থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী সনদে বর্ণিত অন্য একটি হাদিসে বারোজন খলিফার আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, যাদের মাধ্যমে ইসলাম বিজয়ী হবে [৬]। এই হাদিসটি কিন্তু সাফিনার সেই ত্রিশ বছর বা চারজন খলিফার দাবির পুরোপুরি বিপরীত। খেয়াল করার মতো বিষয় হলো: বারোজন খলিফার সেই হাদিসে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা সুনির্দিষ্ট কোনো সময়ের সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়নি। আর ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে এই অনির্দিষ্ট রাখার ভঙ্গিটাই আল্লাহর রাসুলের নিজস্ব বাচনভঙ্গির সাথে সবচেয়ে বেশি মানানসই।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে: তাহলে যেসব মুহাদ্দিস সাফিনার এই হাদিসকে 'সহিহ' বা 'হাসান' বলেছেন, তারা কেন বলেছেন? একটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায়: তারা মূলত বর্ণনাকারী সাইদ ইবনে জুমহানের ওপর চোখ বন্ধ করে ভরসা করেছিলেন এবং সাফিনাকে একজন সাহাবি বলে ধরে নিয়েছিলেন।

অথচ খোদ সাইদ ইবনে জুমহানের নির্ভরযোগ্যতা নিয়েই পণ্ডিতদের মাঝে বিস্তর মতভেদ আছে। এমনকি কোনো কোনো মুহাদ্দিস তো সাইদের কাছ থেকে সাফিনার বর্ণিত কোনো হাদিসই গ্রহণ করেন না! কারণ সাফিনার বর্ণনাগুলোতে সব সময়ই অদ্ভুত, অস্বাভাবিক আর আজব সব রূপকথার গল্প (মুনকার ও আজায়িব) মিশে থাকে [৭]। খুব সম্ভবত সাইদ নিজেই সাফিনার সেই আজব গল্পগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন এবং যাচাই-বাছাই ছাড়াই সেগুলো মানুষের কাছে বলে বেড়িয়েছেন।

আসলে রাজনীতি জিনিসটাই এমন। রাজনৈতিক কোনো ডামাডোলের মাঝে কোনো পক্ষ যখন নিজেদের সপক্ষে সামান্যতম কিছু পেয়ে যায়, তখন আর বাছবিচার করে না; অন্ধের মতো লুফে নেয়। সাফিনার এই হাদিসটিও যেহেতু রাজনৈতিক স্বভাবের, তাই একজন মাত্র বর্ণনাকারী, সন্দেহজনক সনদ আর পদে পদে এত সব অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও এটি খুব সহজেই সমাজে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়। পরবর্তী যুগে তো এটি সবার কাছে এমনভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে গেল যে, একেই সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের মূল মাপকাঠি বানিয়ে ফেলা হলো! অথচ সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো: খোদ সাহাবিরা নিজেদের যুগে এই হাদিসের ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও জানতেন না। তাদের কেউ কোনোদিন একে সংবাদ, দলিল বা রেফারেন্স হিসেবে ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করেননি।

টীকা

[১] জামে তিরমিজি, রেওয়ায়েত নম্বর:২২২৬।

[২] সাফিনা (রা.)-এর আসল নাম কি ছিল, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মাঝে মতভেদের যেন কোনো শেষ নেই! ইতিহাসবিদ ওয়াকিদির মতে তার নাম মেহরান বিন ফাররুখ; ইবনে সাদের মতে নাজরান; ইবনুল বারকিবলেন কাইস; আবার ইবনে আবদিল বার বলেছেন উমায়ের।অন্যদিকে আবু নুয়াইম তাঁকে আবাস, আল-আসকারিতাকে সুলাইমান এবং সুহাইলি তাকে তাহমান নামে উল্লেখ করেছেন। এর বাইরেও তাকে রোমান, রাবা, শানবা বিন মারফানা, এমনকি আয়মান নামেও ডাকা হতো বলে কেউ কেউ মত দিয়েছেন। (তথ্যসূত্র– তাহজিবুল কামাল ফি আসমা ইর-রিজাল, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ২০৫)

[৩] মুসনাদে আহমদ, আর-রিসালা সংস্করণ, খণ্ড ৩৬, পৃষ্ঠা ২৫৬।

[৪] আল-জামেউস সহিহ লিস-সুনানি ওয়াল মাসানিদ, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ২৩৫।

[৫] হযরত সাফিনা (রা.)-কে ঘিরে এই চমৎকার বিশ্লেষণ ও ঐতিহাসিক অসঙ্গতিগুলোর দিকে মূলত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিশিষ্ট গবেষক ড. ত্বহা হামিদ আদ-দুলাইমি।

[৬] "ইসলাম বারোজন খলিফা পর্যন্ত শক্তিশালী ওবিজয়ী থাকবে।" বর্ণনাকারি বলেন: এরপর আল্লাহর রাসুল এমন একটি কথা বললেন, যা আমি ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারিনি।পরে আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তিনিআসলে কি বলেছেন?" বাবা উত্তরে বললেন, "তিনি বলেছেন, তারা সবাই কুরাইশ বংশের হবে।" (সহিহ মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪৫৩)।

[৭] সাইদ ইবনে জুমহান এবং সাফিনার হাদিস বর্ণনার বিষয়ে মুহাদ্দিসদের মন্তব্যগুলো বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। যেমন: ইবনে মাইন বলেন, “সাফিনার কাছ থেকে তিনি (সাইদ) এমন কিছু হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা আর কেউ কখনো করেনি। তবে আমি আশা করি এতে কোনো সমস্যা নেই।” (তাহজিবুল কামাল, ৬:৪৩) আবু আহমদ বিন আদিও অনেকটা একই সুরে বলেছেন, “তিনি সাফিনার সূত্রে এমন সব হাদিস এনেছেন, যা অন্য কারো বর্ণনায় পাওয়া যায় না। আমি আশা করি এতে দোষের কিছু নেই, কারণ তার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা এমনিতেই খুব কম।” (তাহজিবুল কামাল, ১০:৩৭৭) তবে আবু উবাইদ আল-আজুরির মন্তব্যটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, “ইনশাআল্লাহ তিনি (সাইদ) নির্ভরযোগ্য একজন মানুষ। যদিও একদল পণ্ডিত তাকে দুর্বল বলেছেন, তবে আসলে এখানে মূল সন্দেহের তীরটি তার ওপরের স্তরেরবর্ণনাকারীর দিকেই যায়।” এরপর তিনি স্পষ্ট করে সেই সন্দেহভাজন ব্যক্তির নামও উল্লেখ করেন, আর তিনি হলেন: সাফিনা! (তাহজিবুলকামাল, ১০:৩৭৭)।

সাহিত্য : গজল

জাভেদ আহমেদ গামিদি

جہاں سے اِس طرح اُٹھے یہ اہلِ مے خانہ
کہ بحر و بر میں عزازیل نے جلاَئے چراغ
فلک کا نوحہ زمیں کے حدود میں پہنچا
کہ کھو دیا ہے ستاروں نے منزلوں کا سراغ

জাহাঁ সে ইস তরাহ উঠে ইয়ে আহলে মে খানা
কে বাহর-ও-বার মেঁ আজাজীল নে জালায়ে চেরাগ
ফলক কা নোহা জমীঁ কে হুদূদ মেঁ পেহঁচা
কে খো দিয়া হ্যায় সিতারোঁ নে মঞ্জিলোঁ কা সুরাগ

আজ ধরণী হতে বিদায় নিলো সুরাপায়ীদের দল।
আজাজীলের কালো ছায়া তাই ছেয়েছে জল-স্থল।
আকাশের ঐ করুণ রোদন ছুঁয়েছে মাটির ভাঁজ।
হারিয়েছে পথ দিশেহারা যত তারাদের সমাজ।

تِرے جہاں میں صداقت کی آبرو کے لیے
نکل پڑے تھے تو ٹھری تھی گردشِ افلاک
مثالِ شعلہ نگاہ و دل و زباں و وجود
فراعنہ کی رعونت فقط خس و خاشاک

তেরে জাহাঁ মেঁ সদাকত কী আব্রু কে লিয়ে
নিকল পড়ে থে তো ঠ্যরি থি গর্দিশ-এ-আফলাক
মিসাল-এ-শো'লা নিগাহ-ও-দিল-ও-জবান-ও-উজুদ
ফারাইনা কী রাউনত ফকত খাস-ও-খাশাক

তোমার জমিনে বেরিয়ে পড়েছি,
রাখতে হকের মান।
হঠাৎ দেখি থমকে গেছে অন্তরীক্ষের প্রাণ।
জ্বলছে ভীষণ সত্তাসমেত চোখ নাক মুখ তাই।
ফেরাউনদের অহমিকা যত পুড়ে হবে সব ছাই।

অনুবাদ: মোহাম্মদ সিয়াম হোসেন